দৈনিক খবর 33

তারিখ 24 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৬

দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

জাতিসংঘ এবং ইউনেসকোর উদ্যোগে ১৯৯০ সাল সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ হিসেবে পালিত হবে। সারা দুনিয়ার ১৭০টি দেশে বিশেষ করে ১২০টি উন্নয়নশীল দেশে এ বর্ষটি সাক্ষরতা বর্ষ হিসেবে পালিত হবে মহাসমারোহে। পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি নিরক্ষর মানুষকে এক দশকে অর্থাৎ ২০০০ সালের মধ্যে কর্ম উপযোগী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ইউনেসকো একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইউনেসকোর এ কর্মসূচীকে বাংলাদেশসহ সকল দেশই স্বাগত জানিয়েছে। বিশেষ করে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিরক্ষতা দূরীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। কারণ, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশে নিরক্ষর লোকের আবাসভূমি হলো এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ভারত গঠন করেছে নিখিল ভারত গণশিক্ষা ও উন্নয়ন কমিটি। ১৯৯০ সালে কলকাতা শহরের বয়স হবে ৩০০ বছর। ভারতের গণশিক্ষা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা শহর ৩০০ বছরে পদার্পণ করতেই তারা এই শহরকে নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষণা করবে।

১৯৬০ সালে বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব- পাকিস্তান) বয়স্ক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বপক্ষে যথেষ্ট জনমত সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পৃথিবীকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ইউনেসকোর উদ্যোগে ইরানে ১২ দিনব্যাপী এক বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তানসহ পৃথিবীর ৮৩টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রত্যেক দেশে প্রতি বছর ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের এক ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্বব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় ১৯৬৭ সালে। বাংলাদেশেও (সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান) বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ১৯৬৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

'সাক্ষরতা' বলতে কি বুঝায় এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 'সাক্ষর' (স+অক্ষর) শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। কথাটি 'স্বাক্ষর' (স্বা+অক্ষর) বা দস্তখত নয়। এদেশে ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী 'স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন ভাষায় বাক্য পঠনের ক্ষমতাকেই সাক্ষরতা বলা হয়েছে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে 'যে বুঝে পড়তে পারে সেই সাক্ষর'। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী মতে 'বাংলা, ইংরেজী, আরবী এবং উর্দু-এ ৪টি ভাষার যে কোন একটি ভাষায় লেখা সহজ চিঠি পঠন ও লিখনে সক্ষম ব্যক্তিই সাক্ষর'। আদমশুমারী ১৯৮১ মতে 'চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা'। ১৯৬৫ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সমাবেশে বলা হয় 'উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষাই সাক্ষরতা'। ইউনেসকো বলেছে, 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে যে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয় তাকেই ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলে'। ১৯৮৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হলো, 'সতিকারের সাক্ষর হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর সামাজিক পরিবেশে যে সব কর্মকান্ড লিখন-পঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেগুলোতে কার্যকরভাবে দক্ষতা অর্জন করেছেন'। ১৯৮৯ সালের ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ বাংলাদেশের কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে বেসরকারী সংস্থাসমূহের গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপর এক কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশিবিরের যুগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারিক দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সাক্ষরতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এভাবে- 'মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, পড়তে পারা, সঠিকভাবে ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করা ও লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা লাভ'। কিন্তু বর্তমানে প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেককেই প্রতি পদে গণনার কাজ করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান বলেন, 'দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত ব্যবহারোপযোগী পঠন, লিখন ও গণনার ক্ষমতার্জনই হলো প্রকৃত সাক্ষরতা'।

শিক্ষা মানুষের একটি সাংবিধানিক অধিকার। তাই বর্তমান বিশ্বের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে,'২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা'। এ জনপ্রিয় শ্লোগানের অংগীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অধীনে ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে গ্রহণ করা হয়েছে গণ-শিক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের পাঠ পর্যায়ে সাক্ষরতাদান শুরু হয়েছে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে।

বর্তমান বিশ্বের ১০০ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ নিরক্ষরের বাসভূমি হলো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। আর এই অঞ্চলের অন্যতম দেশ বাংলাদেশের প্রায় চতুর্থাংশ লোক এখনো নিরক্ষর। বর্তমানে পৃথিবীর ১২০টি অনুন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচী চালু থাকলেও জন্মহারের তুলনায় সাক্ষরতার হার কিছুতেই বাড়ছে না। বাংলাদেশের নিরক্ষরতার চিত্র আরো ভয়াবহ। বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ কর্তৃক ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস সংলনে ফেরদাউস খান কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যে বলা হয়েছে 'বাংলাদেশে ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ছিল ১৮.৯%, ১৯৬১ সালে ছিল ২০.৮%, ১৯৭৪ সালে ছিল ২৪.৩% আর ১৯৮১ সালে ছিল ২৩.৮%। তাঁর মতে গত ৩০ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ৪.৯%। এই হিসেবে তাঁর মতে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করতে ৪৬৬ বছর লাগবে।' আর তাই যদি হয়, তাহলে ২০০০ সাল নাগাদ আমরা কি নিরক্ষরতামুক্ত নতুন বাংলাদেশের মুখ দেখতে পাবো? এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিই আজ বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মিলে সর্বমোট প্রায় সাড়ে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ বিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা হলো প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬৫% ভাগ ছেলে-মেয়েকে শিক্ষাদান সম্ভব। অর্থাৎ প্রতি বছর ৩৫% ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসতে সক্ষম হয় না। এভাবে প্রতি বছর প্রায় অর্ধ-কোটি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরেই থেকে যায়। তার উপর আবার বছর বছর স্কুল-ত্যাগীদের (ঢরময-মর্ল্ল) সংখ্যা এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এমতাবস্থায় ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সকলের জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে আরো প্রায় ২৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রায় সাড়ে ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সরকার সারা দেশব্যাপী প্রায় সাড়ে ৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা অপ্রতুল। মসজিদ এবং মক্তবের দেশ বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশে প্রায় ২ লাখেরও অধিক মসজিদ রয়েছে। মক্তবের সংখ্যাও প্রায় ২ লাখের কাছাকাছি। ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এদেশে শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করলে চলবে না। জরুরীভিত্তিতে সকল মসজিদ, মক্তব এবং কমিউনিটি সেন্টারগুলিকেও গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। ২০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশ একই সঙ্গে সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে শরিক হলে ২০০০ সাল নাগাদ নিরক্ষরতামুক্ত সুস্থ সজীব নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।